Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s
Volume – 3, Issue-I, published on January 2023, Page No. 1 –7
Website: https://www.tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
e ISSN : 2583 – 0848

সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে চৈতন্যদেবের উদার ধর্মনীতির অবদান : চৈতন্যচরিত, চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ অবলম্বনে

উমা বেরা
গবেষক, তুলনামূলক সাহিত্য, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : mail2umabera@gmail.com

Keyword
বৃন্দাবনদাস, চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, সন্ন্যাসধর্ম, আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, বৈষ্ণবধর্ম প্রচার

Abstract

Discussion
ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমাজ-সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের উপর প্রভাব ফেলেছিল। তৎকালীন সময়ে সাধারণতঃ দেব-দেবীর কাহিনি নিয়ে অলৌকিক কল্পনার ভিত্তিভূমিতে বিচরণ করে আখ্যানকাব্য, গীতিকাব্য, নাট্যগীতি ইত্যাদি সাহিত্য ধারা রচিত হত। ঐ রচনাগুলির মধ্যে সমাজ বাস্তবতার ছবি হয়ত ফুটে উঠত, তবে তা রূপক চরিত্রের মধ্য দিয়ে। তাই রচয়িতার দার্শনিক মনের পরিচয়ও ওই চরিত্রগুলির মধ্যে নিহিত থাকত।

চৈতন্যদেবের তিরোভাবের পর বাংলা সাহিত্যে তাঁর ধর্ম ও কর্মজীবন নিয়ে চরিত সাহিত্য নামে সাহিত্যধারার জন্ম হয়েছিল। ঐ সাহিত্যধারায় প্রথম অতিলৌকিকতা, অলৌকিকতার কল্পনার বাতাবরণের গণ্ডী ভেঙে মানবজীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা শুরু হয়েছিল আর ঐ সাহিত্যধারায় ফুটে উঠেছিল সমাজবাস্তবতা, ভক্তি নির্মাণের ইতিহাস ও দার্শনিক তত্ত্ব অর্থাৎ মনোস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত রচনা করেছেন চৈতন্যদেবের তিরোভাবের বেশ কয়েক বছরের মধ্যে, আর কৃষ্ণদাস কবিরাজ এই গ্রন্থ রচনার প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর পরে চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ রচনা করেছেন। বৃন্দাবনদাস মূলত চৈতন্যদেবের নবদ্বীপ লীলা অর্থাৎ সন্ন্যাস-পূর্ববর্তী চব্বিশ বছরে ধর্ম ও কর্মজীবন নিয়ে চৈতন্যভাগবত রচনা করেছেন। নবদ্বীপে সমাজ বাস্তবতা এবং কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তির বর্ণনায় বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবত-এ কীভাবে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় দিয়েছেন, অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ মূলত চৈতন্যদেবের সন্ন্যাসগ্রহণের পর পরবর্তী চব্বিশ বছরের নীলাচল লীলার কাহিনি চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। ঐ গ্রন্থ রচনায় কৃষ্ণদাস কবিরাজ নীলাচল, কাশী, বৃন্দাবনের সমাজ বাস্তবতা এবং চৈতন্যদেবের কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তি প্রচারের ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় কীভাবে দিয়েছেন এবং দার্শনিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা কীভাবে করেছেন, এই চরিতগ্রন্থগুলিতে চৈতন্যদেবের মনস্তাত্ত্বিক ভাবের পরিচয় তৎকালীন মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষকে কীভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, বর্তমানেও কীভাবে

চৈতন্যদেবের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা মানবজাতির চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে, সেই তথ্য খোঁজার চেষ্টা করব এই আলোচনায়।

ষোড়শ শতকে চৈতন্যসমকালীন বাংলার শাসনকর্তা হুসেন শাহ ছিলেন উদারচেতা। তাঁর রাজসভায় বহু উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্মচারী ছিল। তিনি সাধারণতঃ হিন্দুদের ধর্মনাশ করতেন না। তবে শাসনব্যবস্থা রক্ষা করার স্বার্থে হিন্দুধর্মে হস্তক্ষেপ ও হিন্দুমন্দির ধ্বংস করতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর ঔদাসীন্য না থাকলে চৈতন্যদেব এত সহজে বাংলায় বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করতে পারতেন না। সেইসময় উড়িষ্যার রাজা ছিলেন পরম বৈষ্ণব ও জগন্নাথসেবক প্রতাপরুদ্র। ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে বাংলা রাজা হুসেন শাহের সঙ্গে উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রায়ই যুদ্ধ হত। ঐ যুদ্ধের ইঙ্গিত বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁদের গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। রামকেলী গ্রামে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবোচিত দীনতা, ধর্মপ্রচার করার ক্ষমতা এবং কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি দেখে হুসেন শাহের দুই উচ্চ পদস্থ কর্মচারী বিষয়ী রূপ-সনাতন অর্থাৎ শাকর মল্লিক এবং দবির খাস মুগ্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা বিধর্মী শাসকের অধীন কর্মজীবন ত্যাগ করে রামকেলিতে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যে এসে মুক্তিপথের সন্ধান পেয়েছিলেন। রূপ-সনাতন সমস্ত সম্পত্তি ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব, আত্মীয়-পরিজনদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে রাজার অগোচরে চৈতন্যদেবের সান্নিধ্যলাভের জন্য গৃহত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। রূপ গোস্বামী রাতের অন্ধকারে বৃন্দাবনের পথে ভাই অনুপমকে নিয়ে যাত্রা করলেও সনাতন গোস্বামী সুলতান হুসেন শাহের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। সনাতন গোস্বামী ছিলেন বাদশার প্রিয়পাত্র। তাই সনাতন তাঁর অধীনে কাজ না করার সিদ্ধান্তের কথা জানালে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বন্দী করেছিলেন। তবে যুদ্ধে যাওয়ার সময় সনাতনকে রাজা হুসেন শাহ সঙ্গে নিতে চেয়েছিলেন কিন্তু তিনি রাজী হননি। কারণ উড়িষ্যায় চৈতন্যদেবের বাস, তাছাড়া তিনি বাদশার অনুপস্থিতিতে মুক্তিলাভের পথ খোঁজার চেষ্টা করতে পারবেন —

> "হেনকালে গেল রাজা উড়িয়া মারিতে।
> সনাতনে কহে তুমি চল মোর সাথে।।
> তেঁহো কহে যাবে তুমি দেবতা নাশিতে।
> মোর শক্তি নাহি তোমার সঙ্গে যাইতে।।"[১]

হুসেন শাহ শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কঠোর ছিলেন। তিনি সহজে কোনো কর্মচারীকে মুক্তি দিতেন না। তাঁর কাছে ধর্মের চেয়ে কর্ম বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই সনাতনের কর্ম ছেড়ে বৈষ্ণবসন্ন্যাসী হয়ে জীবনযাপনের সিদ্ধান্তকে তিনি মেনে নিতে পারেননি।

বৃন্দাবনদাস তাঁর রচনায় বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশ করলেও সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণুতা যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনই তাঁর প্রতিবাদী সত্তা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি চৈতন্যভাগবত-এর স্থানে স্থানে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি কাজী, মুলুকপতির অন্যায়-অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি দেখিয়েছেন। কিন্তু গৌড়ের বাদশা হুসেন শাহ ধর্মবিরোধীদের প্রতি অন্যায় অবিচার করেননি। তিনি শাসনকার্য রক্ষার স্বার্থে হিন্দুরাজাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা উড়িষ্যার দেউল মন্দির ভেঙেছেন — এটা তাঁর ক্ষমতার আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টা মাত্র। কারণ চৈতন্যদেব সন্ন্যাসগ্রহণের পর নীলাচলে কিছুদিন অতিবাহিত করে গৌড়দেশ হয়ে বৃন্দাবনে যাওয়ার জন্য পথচলা শুরু করেছিলেন। চৈতন্যদেব গৌড়ের কাছে রামকেলী গ্রামে কিছুদিন গোপনে বাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর কৃষ্ণনামের মাধুর্য সকলকে মোহিত করায় তিনি নিজেকে আর গোপন রাখতে পারেননি। তিনি রামকেলিসহ সমগ্র গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। হুসেন শাহ এই সন্ন্যাসীর নাম এবং জনপ্রিয়তা কোটালের মুখ থেকে শুনেছিলেন এবং সকলকে নিষেধ করে দিয়েছিলেন যাতে তাঁর ধর্মকার্যের কেউ বাধা না দেয় —

> "রাজা বলে এই মুঞি বলিয়ে সবারে।
> কেহ জানি উপদ্রব করয়ে তাঁহারে।।
> যেখানে তাহান ইচ্ছা থাকুক সেখানে।
> আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধানে।।
> সর্বলোক লই সুখে করুন কীর্তন।

বিরলে থাকুন কিবা যেন লয় মন।।
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন।
কিছু বলিলেই তার লইব জীবন।।"[২]

উদারচেতা হুসেন শাহের শাসনকার্যে ধর্মের ভেদাভেদ ছিল না। রাষ্ট্রের শাসনকার্য সুষ্ঠভাবে পরিচালনা এবং রাষ্ট্রের সীমানারক্ষা ও সীমানাবৃদ্ধির স্বার্থে হুসেন শাহ মন্দির-দেউল ধ্বংস করেছিলেন ঠিকই, তবে তাঁর মানবিকতাবোধ লোপ পায়নি। এই তথ্যই বৃন্দাবন দাস চৈতন্যভাগবত-এ তুলে ধরেছেন।

চৈতন্যদেবের নীলাচলে বাসকালে উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হলে সন্ন্যাসীর ধর্মপালন এবং লোকশিক্ষার স্বার্থে রাজদর্শন করতে রাজি হননি। কারণ, রাজদর্শন এবং স্ত্রীদর্শন বৈষ্ণবসন্ন্যাসীর পক্ষে সমান অপরাধ। চৈতন্যদেব দক্ষিণভারত ভ্রমণ সেরে নীলাচলে ফিরে আসার পর রাজপণ্ডিত সার্বভৌম রাজার ব্যাকুলতার কথা জানিয়ে রাজসাক্ষাতের আবেদন করেছিলেন। এতে চৈতন্যদেব বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন যে দ্বিতীয়বার এই আবেদন করলে তিনি নীলাচল ছেড়ে আলালনাথে চলে যাবেন —

"সার্ব্বভৌম কহে এই প্রতাপরুদ্র রায়।
উৎকণ্ঠিত হঞা তোমা মিলিবারে চায়।।
কর্ণে হস্ত দিয়া প্রভু স্মরে নারায়ণ।
সার্ব্বভৌম কহ কেন অযোগ্যবচন।।
সন্ন্যসী বিরক্ত আমার রাজদরশন।
স্ত্রী-দরশন-সম হয় বিষের ভক্ষণ।।
সার্ব্বভৌম কহে সত্য তোমার বচন।
জগন্নাথ-সেবক রাজা কিন্তু ভক্তোত্তম।।
প্রভু কহে তথাপি রাজা কালসর্পাকার।
কাষ্ঠনারী স্পর্শে যৈছে উপজে বিকার।।
ঐছে বাত পুনরপি সুখে না আনিবে।
পুনঃ যদি কহ আমা এথা না দেখিবে।।"[৩]

সন্ন্যাসধর্মের বড় কর্তব্য হল বিষয়বিমুখতা এবং সামাজিক মোহ ও সাংসারিক বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ। রাজদর্শন যাতে সন্ন্যাসধর্মের এই প্রতিশ্রুতিকে ভুলিয়ে দিতে না পারে; সন্ন্যাসীরা যাতে লক্ষ্যপথে স্থির থাকতে পারেন, চৈতন্যদেবের রাজদর্শন প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সেই পথের ইঙ্গিত দিয়েছেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

সন্ন্যাসধর্ম পালনে চৈতন্যদেব যেমন কঠোরভাবে বিধি-নিষেধ মেনে চলতেন, তেমনই পারিষদদেরও সেই শিক্ষা দিতেন। তবে গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি তাঁর কোনো বিধি-নিষেধ ছিল না। সকলের প্রতি বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্ম পালন, দান, ধ্যানের মাধ্যমে নির্লিপ্তভাবে সাংসারিক জীবনযাপন, অতিথিসেবা ও কৃষ্ণনামস্মরণ গৃহী বৈষ্ণবের প্রধান কর্তব্য। কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'মধ্যলীলা'র পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন শিবানন্দ সেন, মুকুন্দ দত্ত, সত্যরাজ খান, রাঘবপণ্ডিত প্রমুখ গৃহীভক্তদের চৈতন্যদেব সংসারধর্ম পালনের সঙ্গে সঙ্গে বৈষ্ণবধর্ম পালনের উপদেশ দিয়েছেন —

"প্রভু কহে কৃষ্ণ-সেবা বৈষ্ণব সেবন।
নিরন্তর কর কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্তন।।
সত্যরাজ কহে বৈষ্ণব চিনিব কেমনে।
কে বৈষ্ণব কহ তার সামান্য লক্ষণে।।
প্রভু কহে যার মুখে শুনি একবার।
কৃষ্ণনাম পূজ্য সেই শ্রেষ্ঠ সবাকার।।"[৪]

সবসময় কৃষ্ণনাম গ্রহণকারী ভক্তদের আচরণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি ও বৈষ্ণবোচিত দীনতাপ্রকাশ পায়। এছাড়া সাত্ত্বিকভাবে জীবনযাপন করাই বৈষ্ণব উপাসকদের সবচেয়ে বড় কর্তব্য।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃত-এর 'অন্ত্যলীলা'র নবম পরিচ্ছেদে দেখিয়েছেন রাজকর্মচারীরা সঠিক সময়ে রাজার কার্য না করতে পারলে তাঁদের ফাঁসির শাস্তি পর্যন্ত হতে পারত। রাজা যদি কর্মচারীর প্রতি সহানুভূতিশীল হতেন, তাহলেই একমাত্র সেই কর্মচারী মুক্তি লাভ করতে পারতেন। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবভক্ত ভবানন্দ রায়ের পুত্র গোপীনাথ রাজা প্রতাপরুদ্রের দুই লক্ষ কাহন ঠিক সময়ে ফেরত দিতে না পারায় তাঁর ঘোড়াগুলি বাজেয়াপ্ত করেছিলেন এবং তাঁকে বন্দী করার আদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্তে দয়াপরবশ হয়ে প্রতাপরুদ্র কর্মচারী গোপীনাথকে বেতন দ্বিগুণ করে মুক্তি দিয়েছিলেন এবং রাজকাহন অপব্যয় করতে নিষেধ করেছিলেন —

"রাজা কহে সব কৌড়ী তোমারে দাড়িল।
মালজাঠ্যা দণ্ডপাঠ তোমায় বিষয় দিল।।
আরবার ঐছে না খাইহ রাজধন।
আজি হইতে দিল তোমায় দ্বিগুণ বর্ত্তন।।"[৫]

রাজা বৈষ্ণব হলেও বিষয়ী, তাই ঠিকভাবে, নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে বিষয়রক্ষা এবং রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ করা তাঁর দায়িত্ব। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী কোনো গৃহীর রাজস্ব নষ্ট করা ঠিক ধর্ম নয়, কারণ গৃহী বৈষ্ণবের প্রধান ধর্ম সঠিক পথে থেকে সাংসারিক এবং কার্যক্ষেত্রের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা। গোপীনাথ রায় এই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন না করায় তাঁকে রাজবন্দী হতে হয়েছিল। রাজার দয়ায় গোপীনাথ শেষপর্যন্ত মুক্তি ও সম্পত্তি দুইই লাভ করেছিলেন। অর্থাৎ গৃহী হয়ে কর্মজীবনে উদাসীন এবং রাজস্বনষ্ট ধর্মবিরুদ্ধ কর্ম, বৈষ্ণবধর্মেও তার সমর্থন মেলে না। অন্যের ধন দান, অতিথিসেবা, বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর আপ্যায়ণ ইত্যাদি যেকোনো ধর্ম-কর্মই অন্যায়। সংসারে সকল ব্যক্তি যদি বিষয়বিমুখ হয়ে সন্ন্যাসধর্ম পালনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন তবে সংসারধর্ম পালন এবং অতিথিসেবা করবে কে? তাই গৃহী বৈষ্ণবদের সৎপথে থেকে কর্মজীবন যাপন করার মাধ্যমে সংসারধর্ম পালন কর্তব্য। গোপীনাথ রায় বিষয়বিমুখ হতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজার দয়ায় তিনি বিষয়ী হয়েছিলেন।

"প্রভু কহে সন্ন্যাসী যবে হবে পঞ্চজন।
কুটুম্ব বাহুল্য তোমার কে করে ভরণ।।"[৬]

চৈতন্যদেব গৃহীদের মধ্যে বৈষ্ণবধর্মকে বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে দিলেও সকলকে সংসারে থেকে ধর্মপালনের পথ দেখিয়েছিলেন যার ইঙ্গিত চৈতন্যচরিতামৃত এবং চৈতন্যভাগবত গ্রন্থে ফুটে উঠেছে। সত্যরাজ খান, রাঘব পণ্ডিত, শিবানন্দ সেন, মুকুন্দ ঘোষ, শ্রীবাস আচার্য, অদ্বৈত আচার্য প্রমুখ গৃহী বৈষ্ণব উপাসকরা বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সমাজ ও সংসারের প্রতি সব রকম দায়িত্ব সমানভাবে পালন করেছেন এবং গৌড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের ক্ষেত্রেও এঁরা নিজেদেরকেও সমানভাবে নিয়োজিত করেছিলেন। তৎকালীন আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এই বৈষ্ণবরা সামাজিক নানান বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। বিশেষতঃ অবৈষ্ণব ব্রাহ্মণরা এবং পাষণ্ড দাম্ভিক ব্যক্তিরা গৃহী বৈষ্ণবদের নানাভাবে লাঞ্ছনা করতেন তার প্রতিচ্ছবি বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় প্রকাশিত হয়েছে।

রাতের অন্ধকারে গোপাল-চাপাল লক্ষ্মী-নারায়ণের সেবক শ্রীবাসের গৃহপ্রাঙ্গনে চণ্ডীমূর্তি ও মদ্য-মাংস রেখে গিয়েছিলেন। শ্রীবাস আচার্য ভণ্ড বৈষ্ণব একথা সকালবেলায় সকল সমাজপতির কাছে সত্য প্রমাণ করার জন্যই এই ষড়যন্ত্র। কিন্তু শ্রীবাস পণ্ডিত সমাজপতিদের কাছ থেকে অপমানিত হওয়ার আগে নিজেই বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের সঙ্গে দোষস্বীকার করে নিয়েছিলেন যে তিনি সারাদিন নামসংকীর্তন করেন আর রাতে মদ্য-মাংস খেয়ে ভবানীপূজা করেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখায় তৎকালীন সমাজচিত্রের প্রতিফলন লক্ষ করা যায় —

"একদিন বিপ্র নাম গোপাল চাপাল।
পাষণ্ডী প্রধান সেই দুর্ম্মুখ বাচাল।।
ভবানীপূজার সব সামগ্রী লইয়া।
রাত্র্যে শ্রীবাসের দ্বারা স্থান লেপিয়া।।
কলার পাত উপরে থুইলা ওড্র ফুল।
হরিদ্রা সিন্দুর রক্তচন্দন তণ্ডুল।।
মদ্যভাণ্ড পাশে ধরি নিজঘরে গেলা।

প্রাতঃকালে শ্রীবাস আসি তাহা দেখিলা।।
বড় বড় লোক সব আনিল ডাকিয়া।
সবারে কহে শ্রীবাস হাসিয়া হাসিয়া।।
নিত্য রাত্র্যে করি আমি ভবানী পূজন।
আমার মহিমা দেখ ব্রাহ্মণ-সজ্জন।"[৭]

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে গৃহী বৈষ্ণবের প্রতি পাষণ্ড অবৈষ্ণবের অন্যায়ের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে এই সত্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে সৎপথে থেকে ভক্তি ভরে ধর্ম-কর্ম পালন করাই বড় ধর্ম।

চৈতন্যদেব জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেরই মধ্যে বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করেছিলেন। যবন হরিদাসের চৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দের আলিঙ্গনলাভ এবং পার্ষদ হিসেবে স্থানলাভ মধ্যযুগে বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম নিদর্শন। পরবর্তীকালে যবন হরিদাসের কৃষ্ণভক্তির মহিমা বৈষ্ণবধর্মে এক অসামান্য নিদর্শন রেখে গেছে। তৎকালীন সময়ে যবন হরিদাস হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের সমাজপতি এবং অবৈষ্ণব পাষণ্ডদের হাতে লাঞ্ছিত হয়ে অক্লেশে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করেছেন এবং কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রচার করেছিলেন। তিনি নিত্যানন্দের সঙ্গে নবদ্বীপের গ্রামে গ্রামে কীর্তন করে বেড়িয়েছিলেন বলে বৃন্দাবনদাস এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজ জানিয়েছেন। চৈতন্যভাগবত-এ যবন হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির অপার মহিমা বর্ণিত হয়েছে –

"কর যোড় করি বোলে প্রভু হরিদাস।
মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ।।
তোমার চরণ ভজে যে সকল দাস।
তার অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস।।
সেই যে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম।
সেই অবশেষ মোর ক্রিয়া কুলধর্ম।।
তোমার স্মরণহীন পাপী জন্ম মোর।
সফল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোর।।
এহো মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয়।
মহাপদ চাহোঁ যে আমার যোগ্য নয়।।
প্রভু রে নাথ রে মোর বাপ বিশ্বম্ভর।
মৃত মুঞি মোর অপরাধ ক্ষমা কর।।
শচীর নন্দন বাপ কৃপা কর মোরে।
কুক্কুর করিয়া মোরে রাখ ভক্ত ঘরে।।
প্রেমভক্তিময় হৈলা প্রভু হরিদাস।
পুনঃ পুনঃ করে কাকু না পুরয়ে আশ।।"[৮]

নগর কীর্তন, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবদের সঙ্গে যবন হরিদাসের কথোপকথন, শ্রীবাস এবং অদ্বৈতাচার্যের গৃহে মহাপ্রভুর সঙ্গে কীর্তনে অংশগ্রহণ, কাজী দলনে সর্বাগ্রে কীর্তন এবং দুই লক্ষ বার নিভৃতে বসে কৃষ্ণনাম গ্রহণের পর অন্নগ্রহণের মাধ্যমে যবন হরিদাসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মহিমা বর্ণিত হয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণদাস কবিরাজও কঠোর নিষ্ঠার সঙ্গে বৈষ্ণবোচিত দীনতা প্রকাশের মাধ্যমে বৃদ্ধ যবন হরিদসের কৃষ্ণপ্রেমভক্তির মহিমা বর্ণনা করেছেন। তাঁর কঠোর ব্রতের সঙ্গে কৃষ্ণনাম গ্রহণ এবং প্রেমভক্তির প্রকাশ বৈষ্ণবভক্তদের ভক্তিধর্মে অনুপ্রাণিত করেছিল। তাঁর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি এবং বৈষ্ণবাচারের দৃঢ় নিষ্ঠা ও কাঠিন্য চৈতন্যচরিতামৃত-এর মধ্যে তুলে ধরা হয়েছে —

"গোবিন্দ কহে উঠ আসি করহ ভোজন।
হরিদাস কহে আজি করিব লঙ্ঘন।।
সংখ্যা-কীর্তন পুরে নাহি কেমনে খাইব।
মহাপ্রসাদ আনিয়াছ কিমতে উপেক্ষিব।।
এত বলি মহাপ্রসাদ করিল বন্দন।

এর রঞ্চ লঞা তার করিল ভক্ষণ।।"[৯]

ধর্মীয় ভেদাভেদের উপরে মানবতাবোধ এবং ভক্তিধর্ম প্রকাশে যবন হরিদাস বৈষ্ণব জীবন যাপনের পথপ্রদর্শক হয়ে রয়েছেন।

উপসংহার :

ষোড়শ শতকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সমাজ-সংস্কৃতির উপর প্রভাব ফেলেছিল। একইভাবে তাঁর কর্মজীবন ও ধর্মাচরণ বাংলা সাহিত্যে এনেছিল এক নতুন মোড়। জন্ম নিয়েছিল চরিতসাহিত্য নামে এক নতুন সাহিত্যধারা। এই সাহিত্যধারাই প্রথম মানুষের জীবনকাহিনি নিয়ে রচিত হয়েছে। এখানে স্থান পেয়েছে সমাজ বাস্তবতা এবং কৃষ্ণ প্রেম-ভক্তির ইতিহাস। ফুটে উঠেছে রচয়িতার দার্শনিক মনের পরিচয়। চরিতগ্রন্থগুলির পরতে পরতে বিশ্লেষিত হয়েছে মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারা।

আলোচ্য চরিতগ্রন্থে চৈতন্যভাগবত ও চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদুটির পরতে পরতে রচয়িতাদের মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় ফুটে উঠেছে। বৃন্দাবনদাস চারিত্রিক দৃঢ়তায় সমাজের অন্যায়ের প্রতিবাদ করলেও বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে চৈতন্যদেবের দার্শনিক মনের পরিচয় দিয়েছেন। চৈতন্যদেব সর্বশাস্ত্রের পণ্ডিত হয়েও তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্যের অহংকার কখনও ছিল না। ধর্মীয় ভেদাভেদের ফলে শত্রুতার বৃদ্ধি নয়, বুদ্ধি দিয়ে বিপদ থেকে মুক্তি লাভ ও শত্রুকে বন্ধু করাই বড় মনের পরিচয়, যা চৈতন্যদেব তাঁর চলার পথে প্রতি পদক্ষেপেই করেছেন এবং বৈষ্ণব ভক্তদেরও সেই পথই দেখিয়েছেন।

সন্ন্যাসজীবন হবে সর্বদা নির্লিপ্ত যেখানে সাংসারিক বা সম্পত্তির কোনও মোহ থাকবে না আর যদি কোনও মোহ থাকে, তাহলে তাকে বুদ্ধি দিয়ে ত্যাগ করাই মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিত্র বর্ণনায় এমনই মনস্তাত্ত্বিক ভাবধারার পরিচয় দিয়েছেন।

চৈতন্যভাগবত এবং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থদুটি আলোচনায় দেখা যায় সৎ পথে থেকে কর্মজীবন যাপন এবং চারিত্রিক দৃঢ়তাই ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রধান আদর্শ। তাই চৈতন্যদেবের আদর্শ যুগে যুগে মহৎ ব্যক্তিদের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মানুষেরও চলার পথের পাথেয় হয়ে আছে।

তথ্যসূত্র :

১. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ১৩২
২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, অন্ত্যলীলা, চতুর্থ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ২৪৫
৩. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬), চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ৮৭
৪. চৈতন্যচরিতামৃত, মধ্যলীলা, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ১০৯
৫. চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ২০৪
৬. চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, নবম পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ২০৫
৭. চৈতন্যচরিতামৃত, আদিলীলা, সপ্তদশ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ৩৩
৮. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, দশম অধ্যায়, তদেব, পৃ. ১২৮-১২৯
৯. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৬), চৈতন্যচরিতামৃত, অন্ত্যলীলা, একাদশ পরিচ্ছেদ, তদেব, পৃ. ২১০

আকর গ্রন্থ :

১. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (২০১৮), বৃন্দাবনদাস বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমী
২. সেন, সুকুমার (সম্পাদিত) (১৯৬৩), কৃষ্ণদাস-কবিরাজ বিরচিত শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত, নতুন দিল্লি : সাহিত্য অকাদেমি

সহায়ক গ্রন্থ :

১. গিরি, সত্যবতী (২০০৭), বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

২. গিরি, সত্যবতী। প্রবন্ধ সঞ্চয়ণ, (সম্পাদনা) মজুমদার, সমরেশ বসু, কলকাতা : রত্নাবলী

৩. চক্রবর্তী, রমাকান্ত (১৯৯৬), বঙ্গে বৈষ্ণব ধর্ম, কলকাতা : আনন্দ পাবলিশার্স

৪. জানা, নরেশচন্দ্র (১৯৯৬), বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী, কলকাতা : দে'জ পাবলিশিং

৫. দত্ত, ভূপেন্দ্রনাথ (২০১১), বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব, কলকাতা : চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড

৬. দাশগুপ্ত, শশীভূষণ (১৩৯৬), শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, কলকাতা : এ. মুখার্জী. এণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ

৭. দাস, ক্ষুদিরাম (২০০৯), বৈষ্ণব রস প্রকাশ, কলকাতা : দে'জ সংস্করণ

৮. নাথ, রাধাগোবিন্দ (সম্পাদিত) (১৯৯৩), শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ-গোস্বামী বিরচিত 'শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে'র ভূমিকা, কলকাতা : সাধনা প্রকাশনী

৯. মজুমদার, বিমানবিহারী (২০০৬), শ্রীচৈতন্যচরিতের উপাদান, কলকাতা : সংস্কৃত বুক ডিপো